সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সোহারাব হোসেন

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া ধস্ত মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদ

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় নামটি, একটি ভিন্নধর্মী শক্তিকেন্দ্র রূপে, এক নব নব সন্দর্ভ-রূপায়ণের আধার রূপে, প্রবল নিয়মে কলকে পাওয়া কথাসাহিত্যের রোমান্সময় ধারার বিপ্রতীপ মেদন্ড রূপে, উল্লেখযোগ্য। গুত্বপূর্ণ। গুত্বপূর্ণ-- তবে প্রচারিত নয়। যে প্রচার ও ব্যাপ্তি তাঁর সময়ের অনেক লেখক-যশপ্রার্থী অলেখক, অনেক কম শক্তিমান লেখক পেয়েছেন, সে তুলনায় বৃহত্তর পাঠক-সমাজে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখালেখি মোটেই পরিচিত নয়। তবে স্বীকার্য, তিনি লিটল ম্যাগাজিনের পাঠক-সম্প্রদায়ের কাছে নব সত্যের আধার রূপে, গুত্বপূর্ণ, বিশিষ্ট। গল্পকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও শক্তি অবিসংবাদিত। বরং তাঁর উপন্যাস নিয়ে সীমিত আলোচনার প্রয়াস করা গেল।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশের আগে তাঁর উপন্যাস-ভাবনা ও ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করা দরকার। স্বভাবে এবং বৈশিষ্ট্য সাধন চট্টোপাধ্যায় একজন যথার্থ ঔপন্যাসিক। উপন্যাস যদি জীবন-সমাজ ও সময়ের খননজাত সন্দর্ভের প্রতীতি বাস্তবতা হয় এবং সেই প্রতীতিময় নতুন বাস্তবতার ব্যঞ্জনাবাহী প্রকাশ হয় তবে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক সত্তা নিঃসন্দেহে শক্তিমান। বর্তমান দিনে, আমরা, বাংলা লেখালিখির যে ধারাটিকে উপন্যাস বলি, তা বোধ হয় একশ' শতাংশ রোমান্স--- উপন্যাস নয়। মানুষের প্রেম-প্রীতি-যৌনতা-ভালবাসাবাসির অতলান্ত রহস্যকে মূর্ত করতেই ব্যস্ত থাকা ঐ সব উপন্যাস সমাজ-সন্দর্ভের, মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার ব্যাপ্তি কিংবা সঙ্কটের লড়াইকে জীবন্ত করতে ব্যর্থ হয়। এবং এই ব্যর্থতার দায় স্বীকার না করে বরং ঐ সব প্রেম-পীরিতের রোমান্টিক সুখপাঠ্য রচনায় পারদর্শী হয়ে ওই সব রোমান্সের রচয়িতারা মাঘা বোধ করেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর উপন্যাস ঠিক এর বিপ্রতীপ মের। সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র, বাংলা উপন্যাসের ভিন্নধর্মী শক্তিকেন্দ্র।

আর এই কারণেই তিনি তাঁর উপন্যাসে নিছক প্রেম-পীরিতের খেলা না খেলে সময়ের মুহুর্মুহু পরিবর্তন, সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদকে ক্রমবিবর্তনে উপন্যাসে-উপন্যাসে মূর্ত করে তোলেন। তাই বলে প্রেম-পীরিত-নরনারীর সম্পর্কশূন্য কি তাঁর উপন্যাস? না। তিনিও ওই সব মানবিক সম্পর্ককে ধরেন, তবে তা ওই অস্তিত্বহীন মানুষের আর্তনাদের অঙ্গ হিসাবেই আঁকেন। তা, এই মানদন্ডেই, বর্তমান 'ধারার লেখকদের' খেলাখেলির থকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

এবার সূত্রাকারে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন
১. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ-পরিবর্তন ও রাজনীতি সর্বসময় একটা নির্ণায়ক শক্তি রূপে বর্তমান থাকে। বর্তমান সময়ে সমাজ-মানুষের পক্ষে রাজনীতি-বিবিক্ত জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব। রাজনীতিই এখন মানুষের ভাগ্যরেখাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের আর্থিক-জীবনটিকেও। সাধন চট্টোপাধ্যায় তীব্র পর্যবেক্ষণে ও তীক্ষ্ম সমাজ বিশ্লেষণে রাজনীতি পৃক্ত মানব জীবনকে তাঁর উপন্যাসে বিধৃত করেন।

২. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমাদের বুদ্ধিতন্ত্রী ও হৃদয়তন্ত্রীতে সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার আর্তনাদকে মুহুর্মুহু তরঙ্গ-ধ্বনিতে প্রেরণ করেন। সেখানে উপন্যাসে-উপন্যাসে মূর্ত হয় ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট, সমাজের অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব মানবাত্মার অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটের চালচর্যা।
৩. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পটভূমি মূলত গ্রাম। গ্রামভিত্তিক মানুষের ওঠা-নামা, জটিলতা-রহস্যময়তা এবং ক্রম পরিবর্তনশীলতা তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মনোগঠনকে পুষ্ট করে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলভিত্তিক যে সব গ্রাম্যমানুষ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে, পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে, দল-বেদলে, পক্ষ-বিপক্ষে বেঁচে বর্তে আছে, তাদেরকে নিয়ে আজকের গ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা। ভিন্ন রকমের। ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় বর্তমানের এই পরিবর্তমান গ্রামজীবনকে সচেতন প্রজ্ঞায় ধরেছেন।
৪. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মুখ ও মুখোশ পরা আধুনিক মানুষেরা মিছিল করে এসেছে। সুবিধাবাদী, আত্মসুখসর্বস্ব, দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বিনীত, রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বগ নিয়ন্ত্রণপুষ্ট মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদী মানুষের যে নিয়ত সংগ্রামমুখর সময় প্রবাহ বর্তমান কালে চলছে, সাধন চট্টোপাধ্যায় সেই সব দ্বন্দ্বময় মানুষকে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু গ্রহণ করেননি, তাদের আঁতের কথার বিশ্লেষণ, উপন্যাসে বর্তমানের সময়-বাস্তবতার বিকল্প এক বাস্তবতার সন্দর্ভ রচনায় সিদ্ধকাম হয়েছেন।
৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস দেশীয় সংস্কৃতির শিকড়-সম্পৃক্ত রসে জারিত। তিনি নানান পৌরাণিক কাহিনী, প্রচলিত মিথ, মন্ত্রতন্ত্র, ইতিহাস-উপাখ্যানকে আধুনিক বিশ্বের ধরনে-ধারনে তাঁর কাহিনী বয়ানের মধ্যে মিশিয়ে দেন অনবদ্য ভাবে। সে সব ক্ষেত্রে, উপন্যাস, পাশ্চাত্য আধুনিকতার উর্দ্ধে উঠে দেশীয় এক আধুনিকতায় মন্ডিত হয়। স্বতন্ত্র হয়।
এত সব বৈশিষ্ট্যের মেলবন্ধনে সত্যই তাঁর উপন্যাস নব নব সন্দর্ভের স্বতন্ত্র আধার। তাঁর 'অগ্নিদগ্ধ', 'গহিন গাঙ', 'দুই ঠিকানা', 'উদ্যোগ পর্ব', 'পিতৃভূমি', 'পক্ষ-বিপক্ষ', 'জলতিমির'-- সমস্ত উপন্যাসেই এই নব-সন্দর্ভের ঠিক-ঠিকানা অঙ্কিত। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর তিনটি উপন্যাস-- 'গহিন গাঙ', 'পক্ষ-বিপক্ষ', ও 'জলতিমির'-- নিয়ে আলোচনা করা হল। এক অর্থে তিনটি উপন্যাসকে সময়-সঙ্কটের আবর্তে আটকে পড়া ধ্বস্ত মানুষের আর্তনাদের ট্রিলজি বলা যেতে পারে। এখানে পরপর তিন উপন্যাসের গভীর পাঠ নেওয়া হল। গহিন গাঙ ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটে খাদক-খাদ্য সম্পর্কের নব শিল্পরূপ গাঙের নামটি বেতনা। সে শান্ত। সে নিরীহ। সে মালোপাড়ার জীবন চর্যার প্রতীক। বেতনা চলার খেয়ালে চলে। মালো জীবনও চলে। তবে চলার খেয়ালে নয়। নিজের খেয়ালে তাদেরকে চলতে দেয়না ধর্মবাঁধন, ধর্মবৈষম্য, অর্থনৈতিক অসম বিন্যাস, সংস্কারের অচলায়তন, রাজনীতির পাশা চালাচালি আর গৃহগত সুখ-অসুখের ঈর্ষা। এত সব বাধা-বাঁধন মালোপাড়ার স্বাভাবিক জীবনকে জটিল করে, কুটিল করে, দ্বান্দ্বিক করে, সঙ্কীর্ণ করে, বিদ্রোহী করে, নিঃস্ব করে আবার নিজস্ব খেয়ালে চলার দায় মাথায় নিয়ে বাঁচার ভিন্ন মাত্রার প্রতিজ্ঞায় ধনী করে। যে গাঙের নামটি বেতনা, যে শান্ত নিরীহ, সেই গাঙ, সেই নদী তখন গহিন হয়, ঘূর্ণিতে মাতে, মালো জীবনের প্রতীক হয়ে ফুঁসে ওঠে। 'গহীন গাঙ' উপন্যাসের একেবারে শেষে বেতনার সেই দ্র মূর্তির রূপান্তর দেখিয়েছেন লেখক
'....সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, মেঘে ঢাকা আকাশ, বাতাস মোচড় দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বেতনা ফুঁসছে। প্রতিদিনের শান্ত, নিরীহ এই গাঙের আজ কী দাপট।'
উপন্যাসে নদীর এই যে বিবর্তন তা আসলে সম্পূর্ণরূপে প্রতীকী। শান্ত, নিরীহ অবস্থা থেকে নদীর এই বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মিশে গেছে মানুষের বিবর্তনের-- এখানে মালো মানুষের বিবর্তনের রূপরেখাটি। নদীতে জল বয়। জলের আর এক নাম জীবন। বিশেষ করে মালোজীবনে জল বহুমুখী মাত্রা নিয়ে জীবন হয়ে দেখা দেয়। তো সেই জলপ্রবাহের এমন বিবর্তনের ইঙ্গিত যখন উপন্যাসে রাখেন ঔপন্যাসিক তখন তা নিছক নিসর্গ বর্ণনার বর্ণচ্ছটা মাত্র থাকে না। তা তখন চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়। চরিত্র যে মানব-সমাজের প্রবাহধারায় অণুকণা সেই সমাজের পরিপূরক হয়ে যায়। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই বিবর্তনের ধারক হয়েছে ব্যক্তি হিসাবে শ্রীপদ এবং সমাজ হিসাবে সুন্দরবনের কোলে বহতা বেতনা নদীর বুকে লালিত হওয়া মালো সমাজ। সে ইজন্যই 'গহিন গাঙের' বিপর্যস্ত নায়ক, নিজের স্বভাবগতি হারানো নায়ক শ্রীপদ বাধ্য হয়ে জঙ্গলে নাও ভাসানোর আগে, মালো সমাজের হিতাকাঙ্খী ভূপতি ডাক্তারকে দৃঢ়স্বরে শুনিয়েছে
'এক মামলা মাথায় নিয়ে যাচ্ছি, ফিরে এলে অন্য মামলা।'

এই 'অন্য মামলা' শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, বাস্তবের নানান মামলায় বিপর্যস্ত, নিঃস্ব নায়ক 'অন্য মামলা', যা অ াসলে প্রতিরোধ প্রবণতা, তা অর্জনের স্তরে এখন উত্তরিত। 'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি আসলে, নিঃস্বতা ও বিপর্যয়কর অবস্থ া ও অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে এমনই প্রতিরোধ-প্রবণতায় উত্তরণের কাহিনী। যদিও এখানে প্রতিরোধপ্রবণ মানসের প্রতিষ্ঠা নেই, আছে প্রতিরোধ প্রবণ মানসের জয়যাত্রার আভাসমাত্র।

উপন্যাসে এই রিক্ততা ও নিঃস্বতা ও বিপর্যস্ততা এসেছে দু দিকে-- এক, ব্যক্তির জীবনে এবং দুই, ব্যক্তিকে জড়িয়ে সমাজের প্রবাহে। ব্যষ্টি জীবনে ও গোষ্ঠী জীবনেরএই যে বিপর্যয় তার নিয়ন্ত্রক হয়েছে মানুষ-- অন্য একদল মানুষ। অর্থাৎ গহিন গ াঙে রয়েছে মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন। এই দ্বন্দ্বকে আমরা পাঁচটি মাত্রায় উপন্যাসে কার্যকর হতে দেখি। সেই পঁ াচটি মাত্রা হল

ক. ধর্মগত দ্বন্দ্ব ঞ খ্রিষ্টান বনাম বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব

খ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগত দ্বন্দ্ব ঞ একদিকে মালো মাঝি বনাম খটিদারের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে কো-অপারেটিভ বনাম খটিদারের দ্বন্দ্ব।

গ. গৃহের আভ্যন্তর ঈর্ষাগত দ্বন্দ্ব ঞ শ্রীপদ বর্মন বনাম লসাই বর্মনের দ্বন্দ্ব।

ঘ. বিশ্বাস-সংস্কারগত দ্বন্দ্ব ঞ মালোপাড়ার প্রবীণের দল বনাম শ্রীপদর দ্বন্দ্ব।

ঙ. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ঞ শ্রীপদর সঙ্গে আবদুল-ঈশ্বরদের দ্বন্দ্ব।

জেলে পাড়ার গোষ্ঠী জীবনের ব্যষ্টি প্রতিনিধি হল শ্রীপদ। সে উপন্যাসের নায়ক। ফলে তার উপরই মূলত এই সব দ্বন্দ্বের ফল বর্ষিত হয়েছে। শ্রীপদর দেহে ও ভাবনায় এই সব দ্বন্দ্বের মন্থনজাত বিষাক্ত তীর আছড়ে পড়েছে। আর নানা দিক দিয়ে ব্যক্তি শ্রীপদ বিপর্যস্ত হয়েছে নিঃস্ব হয়েছে।

শ্রীপদ মালোজীবনের স্বতন্ত্র পথিক। তাকে মালোজীবনের আটপৌরে ভাবনায় মেলানো দুষ্কর। কেননা সে 'নতুন যোবক'। খটিদারদের সহযোগী ও সুদের কারবারি চা-দোকানদার ঈশ্বরের কথায়-- 'না, তেমন কিছু না মেজবাবু, মালোপাড়ার পদর কথা হচ্ছে। তিনি তো নতুন যোবক, বাপ-ঠাকুদ্দার আচার বিচার বিশ্বাস করে না।' এমনিতেই শ্রীপদর ওঠানামা খ্রিষ্ট ান ধর্মে ধর্মান্তরিত মধুর সঙ্গে। তার উপর একদা গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার স্বপ্নে উন্মাদ একদল যুবকের সংস্পর্শে এসেছিল শ্রীপদ। এসব কারণে সে খানিকটা ধর্মবাঁধন ও বিশ্বাস সংস্কারের বিদ্ধে। সে কারণেই সে তার পাড়ার প্রবীণ মাতব্বরদের চক্ষুশূল

'দয়ালের মতো বৃদ্ধ সমাজপতিরা শ্রীপদকে পছন্দ করে না। নবীন সংঘাত আছেই, উপরন্তু শ্রীপদ একটু উগ্র। সংস্কার ম ানতে চায় না। অলৌকিকত্ব তার বিশ্বাসে ঠাঁই পায় না।'

'নতুন যোবক' শ্রীপদ বাস্তবকে দেখে জীবনের অভিজ্ঞতায়। তার কাছে অর্থ ও বেঁচে থাকা আগে, অন্য সব পরের ব্যাপার। তাই সে বাপের মৃত্যুর পর দৃঢ় কণ্ঠে দয়ালকে জানায়

'না জ্যাঠা, দানোর ভয় নিয়ে থাকব, কুশ পুত্তুর পোড়াব না.... দেনায় চুল ডোবা, এবার তলিয়ে যেতে হবে। ...কম করেও হাজার টাকার ধাক্কা। .....ভিটে নিয়ে টান পড়বে, তখন?'

তখন কি হবে তার উত্তর দয়াল না দিলেও আমরা দেখেছি, শ্রীপদ নিজ গোষ্ঠীজীবন থেকে এর ফলে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তার বিপর্যয়ের এটা প্রথম ধাপ।

যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ভয়ে অন্ত্যজ মানুষ হয়েও শ্রীপদ সংস্কারভাঙা 'নতুন যোবক' হতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত সে বিপর্যয়ের হাত থেকে তার নিস্তার মেলেনি। কেননা মালোরা তথা শ্রীপদরা নিয়ন্ত্রিত হয় খটিদারের হাতের অদৃশ্য সুতে ায় বাঁধা থেকে। সেই সুতো-- সুদ, দাদন। অর্থনৈতিক অসম বন্টনের কারণে খটিদার আবদুলেরা শ্রীপদদের উপর অনবরত শোষণ চালায়। সেই শোষণের নাগপাশ থেকে তাদের মুক্তি নেই। মুক্তির চেষ্টা সেখানে বিপর্যয়ের অতল ভয়ঙ্করতায় ও রহস্যময় বিপর্যয়ে পরিণতি পায়। জঙ্গলে বাঘের গালে বাপ ললিতকে দিয়ে এসে শ্রীপদ প্রতিজ্ঞা করেছিল

'না জ্যাঠা, জঙ্গলে আমি যাব না। বেতনায় বিনজালে যা উঠবে, কো-অপারেটিভে বেচলে টাকা বেশি আসে। ... নৌকা অ ার জালের টাকা আবদুলকে তা দিয়েই শুধবো।'

নিজের ছেলের ছয়-ষষ্ঠীর উৎসবের দিনে, টাকার অনিবার্য প্রয়োজনে শ্রীপদ সে চেষ্টা করতে গিয়ে খটিদারের উদগ্র থাব

ার মধ্যে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। শ্রীপদর নির্দেশে মধু খটিদারের চোখের উপর দিয়ে মাছ কো-অপারেটিভে নিয়ে যেতে গেলে বিপত্তি ঘটে

'সতীশ আবদুলের হুকুম পেতেই, খটির ছেলেটা ছুটে এসে চাকোনে হাত দিল। ছুটে লাভ নেই। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল কাছে। নামাতেই আবদুল হেসে বলে 'বাঃ মোকামে এ চিংড়ি ভাল দরই যাবে।.... কোথায় যাচ্ছিল এ মাছ?'

মধু চুপ। আবদুল হেসে বলল, 'ডাক্তারের কো-অপারেটিভে? পদ পাঠালো? বাক্য শেষ না করেই একটানা চাকেনটা পাল্লার দিকে ছুঁড়ে সতীশকে বললো, 'মেপে বরফ সাজা'।

খটিদারের এই উক্তি শ্রীপদর জীবনের স্বপ্নকেও বরফের তলায় চাপা দিয়ে দিল। যে আনন্দের জন্য (ছেলের ছয়-ষষ্ঠী উৎসব) এই মাছ সে কো-অপারেটিভে বেচতে চেয়েছিল, তা হন্তাসের অতলান্ত প্রদেশে হারিয়ে গেল। --এটা শ্রীপদর বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ধাপ। মাঝে আছে এই বিপর্যয়ের তীক্ষ্মতা। সেখানে, সহোদর লকাইকে দিয়ে আবদুল শ্রীপদকে সর্বক্ষণ খুঁচিয়ে গেছে। বাপের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে থানায় নালিশ করিয়েছে। গৃহে অশান্তি নামিয়েছে। উৎসবের দিন ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামারি বাধিয়ে দিয়ে সমস্ত আনন্দকে মাটি করে দিয়েছে। ফলে যে শ্রীপদ 'নতুন যোবক' হয়ে ভিন্ন হতে চেয়েছিল, সে বিপর্যয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সে আবারও জঙ্গলে পাড়ি দেবার সিদ্ধান্ত নিল। শুধু তাই নয়, যে একদা নিজের পিতার 'কুশপুত্তুর' পোড়াতে অস্বীকার করেছিল, সে নিজের 'কুশপুত্তুর' আগে থেকে পুড়িয়েছে

'.....আজ খানিক তাকিয়ে খড়ের আগুন দেখতে দেখতে জবাব দিল, ছেলেটাকে মুক্তি দিচ্ছি। ...কী পোড়াচ্ছি জানিস?'

'কী মুখ নাড়ছ তুমি?'

'তোরা খ্রিষ্টান, বুঝবি না। ....আমার কুশপুত্তুর! ...কোনওদিন যদি না-ও ফিরে আসি, ছেলেটাকে কেউ এর ভয় দেখিয়ে দেনায় গাঁথতে পারবে না।'

সব হারানোর ব্যথা ও অপচয় রোধের অনুভূতির এ চূড়ান্ত পরিণতি। ব্যক্তির অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট এখানে তীব্র। লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় পরিবর্তমান গ্রামমানুষের সঙ্কটকে এভাবেই সূচীমুখে আনেন। যেখানে ব্যক্তি নানান ফাঁদের চাপে পড়ে রিক্ত হয়ে পড়ে, নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেখানে নদী শুধু গহিন হয় না, নদীমাতৃক জীবনের হাঁ-মুখটিই গহিন হয়-- ভয়াল হয়। কো-অপারেটিভের ভূপতি ডাক্তারের কথায়

'ব্যাটারা, সে রাতে বলেছিলাম না, এটা গহিন গাঙ। মনে যা চাইলাম, তাই করলাম, এখানে চলে না।'

ব্যক্তির এই অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট তীব্রতর হয়ে সমাজ-সঙ্কটের সূচীমুখটাকে চিহ্নিত করে ফেলে মুহূর্তেই

'দয়ালের দাওয়ায় শ্রীপদ কেঁদে ফেলল ঝর ঝর। সে এখন পিতা, ঘরে শিশু সন্তান, কী করে জঙ্গলে সর্বনাশীর কাছে যাবে? যদি কোনওদিন ফিরতে না পারে? তার উত্তরাধিকার যাবে ভেসে। হয়ত বটু পাগলটার মতো মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইবে, কড়ি উঠবে গিয়ে নদীর তীরের দরমার ব্যারাকে। শহরের পথে ননীবালা নিঃসাড় পড়ে ভিক্ষা চাইবে কোনওদিন। তার মতো কত পরিবার শহরের পথে এভাবে পরিচয় হারিয়ে ঝড়-জল মাথায় জীবন-মৃত্যুর সীমারেখায় ধুঁকছে।'

এখানে স্পষ্ট-- ব্যক্তি শ্রীপদর বিপর্যয় সামাজিক বিপর্যয়ের সূচীমুখটিকে উন্মুক্ত করেছে। এবং এটা সাধিত হয়েছে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের সূত্রে। কেননা, কাহিনীর শুতে দেখেছি, বাঘের কামড়ে মারা গেছে ললিত। আর কাহিনীর শেষে দেখছি, খটিদারের কামড়ে শ্রীপদ সর্বস্বান্ত হয়েছে। ব্যাপারটি সমান্তরাল। কেননা

প্রথমক্ষেত্রে বাঘ ঞ খাদক

ললিত ঞ খাদ্য

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খটিদার ঞ খাদক

শ্রীপদ ঞ খাদ্য

'গহিন গাঙ' এ খাদক খাদ্যের উপর সর্বগ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিকই। কিন্তু খাদ্য যদি 'নতুন যোবক' হয় তবে সে তো খাদ্য হওয়ার আগে একটি অন্তিম মোচড় দেবেই, যার দাপটে খাদকের প্রাণে কিছুটা ভয় ঢুকলেও ঢুকতে পারে। 'নতুন যোবক' শ্রীপদ এখানে বেতনা গাঙের ফুঁসে ওঠার মতো 'অন্য মামলা' লড়ার প্রতিজ্ঞাতে সেই মোচড় দেয়। সেই মোচড়েই 'গহিন গাঙ' উপন্যাস হিসাবে বাঙলা নদীমাতৃক উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্যপাঠের পত্তন করে।

পক্ষ বিপক্ষ ব্যক্তি ট্র্যাজেডির হাত ধরে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রবল ঘূর্ণিচক্র

দ্রুত বদলে যাচ্ছে ব্যক্তি মানুষ-- শহরে, গ্রামেও । হ্যাঁ, গ্রামেও। ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় হিসাবে গ্রামের যে পরিচয় বাংলা উপন্যাসে, ওপরে-ওপরে পর্যবেক্ষণ করে, ঔপন্যাসিকরা দিয়ে থাকেন, সে গ্রাম এখন নেই, কোনওদিনই ছিল কিনা সন্দেহ! গ্রামের মানুষ, এখন ব্যাপক বিস্তারে বদলে গেছে। জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। ভিতরের মানুষটাকে লুকিয়ে রাখার বহুমুখী বিচিত্র কৌশল শিখে নিয়েছে সে মানুষ। এর জন্য সে নিত্য নিত্য নানারকম মুখোশ পরে নিচ্ছে আজকাল। এই পরিবর্তন, মানুষের এই বদলে যাওয়া অতি দ্রুত হয়েছে সত্তর দশকের নকশাল বাড়ি কৃষক আন্দোলন, এদেশে জরী অবস্থা জারি, পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনের কায়েম, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শুভ সূচনা এবং আপামর গ্রামবাংলার মানুষের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজীক ক্ষমতালাভের কারণে। ফলে কোনও রকম একমুখী রঙে গ্রামের মানুষকে মাপা মানেই বুঝতে হবে লেখক গ্রাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায় এখানেই স্বতন্ত্র ও শক্তিমান। তিনি গ্রামের এই পরিবর্তমান রূপটিকে গভীর মনোযোগ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনুভব করেছেন মানুষের আঁতের জটিলতাকে। 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসে সেই জটিলতার অভিনব শিল্পরূপের পরিচয় মেলে।

জটিল মানুষ নিজের তীক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির কারণে প্রায়শ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী ও স্বার্থসর্বস্ব হয়ে থাকে। আর তার সুবিধাবাদীতার কারণে সৎ ও আদর্শবাদী মানুষ গভীর সঙ্কটে পড়ে। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অসহায় আস্থাহীন হয়ে তীব্র ট্রাজেডির কবলে নিক্ষিপ্ত হয়। এবং সেই ট্রাজেডি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে সামাজিক জনমন্ডলীর অবক্ষয়ের সূচক হয়। 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসটি গ্রামজীবনের এতবিধ অবক্ষয়ের নতুন অভিসন্দর্ভ। সেখানে পক্ষ ও বিপক্ষের কৌশলী লড়াই, মুখোশ পরাপরি,সুবিধাসর্বস্ব রাজনীতিকে নতুন যুগের বাস্তবতা বলে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা, সেই তালে ব্যক্তি-মানুষের অর্থগত আখের গোছানোর প্রচেষ্টা-- এই উপন্যাসের সামাজিক অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটের পিছনে নিরন্তর কাজ করে গেছে। এই কার্যকর মানদন্ডটি পক্ষ ও বিপক্ষের নীতি ও নীতিহীনতার মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। ব্যাপারটি স্পষ্ট করা দরকার

পক্ষ ঃ নীতিনিষ্ঠ মানুষ।

এদের দুটি মাত্রা। এক, জমির অধিকারের লড়াইতে অগ্রণী গগন ভাংগির ছেলে গোকুল ভাংগির নীতি আঁকড়ে লড়াই। বাম রাজনীতির স্পষ্ট ও আদর্শবান দিকটি এখানে ব্যক্ত। দুই, চিরকেলে কায়েমী স্বার্থময় পরিবারের মেয়ে দুলালীর আদর্শগত লড়াই।

গোকুল, তার সাকরেদ পশুপতি এবং দুলালী গ্রামজীবনের টাটকা সতেজ সুস্থ চিন্তার দিক। কিন্তু তারা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। তাদের পক্ষীয় সমর্থকরাও সংখ্যালঘু। তাই তারা কোণঠাসা।

বিপক্ষ ঃ নীতিহীন মানুষ।

এদের দুটি মাত্রা। এক, এককালে (প্রথম দুই পঞ্চায়েত পর্যন্ত) বাম আন্দোলনের পুরোধা,সর্বহারার উন্নতির সমর্থক প্রশান্ত, ধ্রুবরা নিজেদের ব্যক্তিক উচ্চাকাঙ্খা নিবৃত্তির কারণে দলের নীতিকে বদলে নিতে পিছপা নয়। তারা সুবিধাবাদের জয় ঘোষণা করে পরিবর্তিত বাস্তবতার তত্ত্ব ছাড়ে। দুই, চিরকেলে কায়েমী স্বার্থের দাসত্বকারী ও প্রভুত্বকারী বাদল ডাক্তার ও উৎপলরা পরিবর্তিত রাজনীতিতে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য গরিবের পার্টিতেও লেখাপড়া জানার কারণে ও 'বলিয়ে - কইয়ে' হওয়ার কারণে নেতৃত্বে ভেসে উঠতে পারে।

এখানে আমরা কী দেখছি পাঠক? পক্ষ ও বিপক্ষ কেমনভাবে ও কাদেরকে নিয়ে গঠিত হল? কোনও সরল সমীকরণে কি গড়ে উঠেছে এই পক্ষ ও বিপক্ষের জোট? না, অবশ্যই না। পক্ষ ও বিপক্ষের এই জোট গড়ে উঠেছে নানান হিসাব-নিকাশের সিঁড়ি বেয়ে। সে হিসাব দেনা-পাওনার হিসাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। নীতি আদর্শের বালাই কম, খুব কম। প্রয়োজনে 'বিপক্ষ' জোটে উপজোট গড়ে উঠেছে (বাদল, ধ্রুব ও উৎপলের মধ্যে) ওই পাওনা-গন্ডার সুবিধার মধ্য দিয়ে।

জোট গঠনের ক্ষেত্রে এই যে জটিল সমীকরণ ও পালাবদল, তাকে একমুখী রঙে ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। গোকুলের নীতির লড়াইকে যদিও সরলসোজা পথে ব্যাখ্যা করা যায়, তো দুলালীর গোকুল প্রীতি ও নীতির লড়াইকে দুরাধিগম্য মননে বুঝতে হয়। বোদল ডাক্তারের কায়েমী স্বার্থের প্রতীক বিভূতি প্রীতির পিছনে যদি থাকে কাম-কামনার লালসা তবে বিভূতিপুত্র

শচীনন্দন প্রীতির পিছনে আছে অর্থলোলুপতা। আবার তার সর্বহারা রাজনীতির সমর্থক ও নেতা হবার পিছনে রয়েছে স
ামাজিক দিকে প্রতিষ্ঠা-লোভ। আবার উৎপলের এবং হারানের পৈতৃক-সম্পত্তি হস্তগত করার যে ঈর্ষা কাজ করেছে তা
ভিন্নরঙে জীবন্ত। এই কারণে উৎপল পার্টিতে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন মতো ভালোমানুষের মুখোশ পরে নিয়েছে।
অন্যদিকে স্কুল-সংক্রান্ত নানান অসংগতি নিয়ে দুলালী যে-সব প্রশ্ন তুলেছে তাকে কবরের গহ্বরে পাঠানোর জন্য বাদল-
নিশিকান্ত-প্রশান্তরা তাকে পাগল সাজিয়ে ছেড়েছে। ---অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি বদলে যাওয়া গ্রাম ও গ্রামের বিভিন্ন রঙ-
রঙানো মানুষের বিচিত্র কর্মকান্ডপক্ষ ও বিপক্ষ জোটের দলভুক্ত মানুষ করে চলেছে।
এইসব কর্মকান্ডের পিছনে ঔপন্যাসিক দ্বিবিধ মানবিক বৃত্তিকে দুই পক্ষে বলবান করেছেন। সে দুটি হল
ক. বুদ্ধি ও অঙ্ক ঞ্চ বাদল, উৎপল, ধ্রুব, প্রশান্ত, শচীনন্দন প্রমুখ ঘোড়েল শ্রেণীর চরিত্র বুদ্ধিবৃত্তিকে তাদের সমস্ত কর্মের
ভিত্তিতে রেখে, দস্তুর মতো অঙ্ক কষে বিপক্ষ শক্তিকে ঘায়েল করেছে ও নিজ নিজ স্বার্থের সিদ্ধি ঘটিয়েছে। যেমন, বাদল ও
শচীনন্দন অঙ্ক কষে গগন ভাংগিকে বর্গা জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে--- ঘরছাড়া করেছে।
প্রধান বাদল ডাক্তার অঙ্ক কষেই পার্টিতে তার প্রতিস্পর্ধী গোকুলকে ধরাশায়ী করেছে। গোকুলের সততা ও সরলতাকে
কুৎসার মানদন্ডে বিদ্ধ করে গোকুলকে দল ছাড়া করেছে।
উৎপল পরবর্তী পঞ্চায়েতের প্রধান হবার জন্য ধ্রুবকে অঙ্ক কষেই হারিয়ে দিয়েছে। এমনটি ঘটেছে ঘন ঘন, প্রচুর।
খ. আবেগ ও সহানুভূতি ঞ্চ সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ গোকুল ও দুলালী চালিত হয়েছে আবেগের দ্বারা, সহানুভূতির দ্বারা। তাদের
কর্ম ও চিন্তাধারার পিছনে যুক্তি, বুদ্ধি ও অঙ্ক একেবারে যে কাজ করেনি তা নয়, কিন্তু আবেগ ও সহানুভূতির বৃত্তির বেগব
ান ধারার কাছে চাপা পড়ে গেছে। আর এই কারণে যথেষ্ট মূল্য গুণতে হয়েছে দু'জনকেই।
যেমন, গোকুল সাত-পাঁচ না ভেবে পঞ্চায়েত মিটিংয়ে বিরোধী-দলের সামনেই নিজ দলের প্রধানের বিদ্ধে বিদ্রোহ করেছে
আদর্শের আবেগে। কিংবা, চরিত্রহারা পাখির গর্ভপাত করিয়ে তাকে লোক-লজ্জার হাত থেকে গোকুল বাঁচানোর চেষ্টা
করেছে সহানুভূতির কারণে। এবং দুটি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট ভালো কাজ করা সত্বেও তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। পরিণাম
হয়েছে হতাশার-- সে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে দুলালীর নীতির লড়াইও যতখা
নি আবেগ দ্বারা চালিত ছিল ততখানি অঙ্কের হিসেবে নয়। ফলে পরিবারে ও স্কুলে সে একাকী হয়ে পড়েছে, মানসিক ভাবে
রিক্ত হয়ে পড়েছে।
বুদ্ধিবৃত্তি, অঙ্ক বনাম আবেগ-- আদর্শের অবিরাম লড়াই সারাটা উপন্যাস জুড়ে চলেছে। এবং এই লড়াইতে পরাস্ত হয়ে,
অঙ্কের প্যাঁচে হার মেনে দুই ব্যক্তি চরিত্র গোকুল ও দুলালী গভীর ট্রাজেডির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই ব্যক্তি ট্রাজেডির স্ব
রূপ বোঝা দরকার, যেমন
ক. দুলালীর ক্ষেত্রে
'দুলালী সত্যিই হাঁপিয়ে গেছে। কোনও কিছুর বাধার বিদ্ধে লড়াই চালানো ছিল ওর স্বভাব। ইদানীং সে হাল ছেড়ে
দিচ্ছে।'
খ. গোকুলের ক্ষেত্রে
'আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাধবপুর থেকে গোকুলের কপালে পার্টির টিকিট জুটল না। অনেক অভিযোগের মধ্যে প্রধান
দুটো অভিযোগ ছিল শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং চরিত্রগত ত্রুটি। ....পার্টি গোকুলকে আর দায়িত্বে রাখতে রাজি নয়। ফলে বিরা
শির পর থেকে শনৈ শনৈ যে প্রস্তুতি চলছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তার আয়োজন প্রায় চূড়ান্ত হতে চলেছে।'
তবে কী দুলালী কী গোকুল এই ট্রাজেডি ও অবক্ষয়জনিত ঘূর্ণিচক্রের প্রকোপ থেকে বেঁচে উঠতে চেয়েছে। তারা প্রতিরোধ
গড়ে তোলার সঙ্কল্প নিয়েছে। আর যেহেতু এই প্রতিরোধের পিছনে সমাজ-রাজনীতির একটি সার্বিক মাত্রা যুক্ত রয়েছে,
সেহেতু এই ব্যক্তি ট্র্যাজেডি ও প্রতিরোধ-সম্ভাবনা সামাজিক-বিস্তারে ব্যাপ্ত হয়েছে। যদিও সমাজের সেই সংগ্রাম যথেষ্ট
কঠিন
১. 'ফলে গোকুলের দায়িত্ব এখন সংগঠনকে নতুন ভঙ্গিতে মজবুত করা। আগামী দিনগুলোর সংগ্রাম নাকি আরও কঠিন
ও দুস্তর।"
২. দুলালী আস্তে বলে--- এখন তো একটাই পরীক্ষা, ঘুণে ধরিয়ে দেওয়া যাবে কি যাবে না, ভেতর বার বলে কথা নেই।

এ বড় সাংঘাতিক।

দুলালী যে সাংঘাতিক সময়ের কথা বলেছে, গোকুল যে কঠিন ও দুস্তর সংগ্রামের কথা ভেবেছে--- তা আসলে জটিল সংসার ও সমাজের অবক্ষয়ের ঘূর্ণিচক্রের নিশানাকেই মূর্ত করেছে। তাদের বিপক্ষ-দলের প্রশান্ত দুলালী সম্পর্কে যে কথা বলেছে তা এখানে উদ্ধারযোগ্য-- 'শুনে রাখ দুলালী, পরিস্থিতি বুঝে চলবে, কোনও কিছু আঁকড়ে থাকবে না। সময়ের তালে সব কিছুর নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়। তত্ত্ব আর বাস্তব এক কথা নয়।'--- সময়ের সাথে সাথে এই যে নতুন সংজ্ঞা তৈরির কথা বলা হয়েছে--- তা গ্রামের বদলে যাওয়ার স্মারক। গ্রাম সমাজের এই বদলে যাওয়া ঘূর্ণিচক্রের শিল্পরূপদানেই 'পক্ষ বিপক্ষ' উপন্যাসের সমস্ত শক্তি নিহিত।

'গহিন গাঙ' উপন্যাসের শেষে নায়ক শ্রীপদ যে 'অন্যমামলা' লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল, 'পক্ষ বিপক্ষ' তে, সেই লড়াইয়ের উত্তরণ ঘটেছে। এখানে সমাজ-বিস্তারের প্রেক্ষিতে গোকুল-দুলালী সারাটা উপন্যাস-জুড়ে সেই মামলা লড়েছে। এই লড়াই একার না হয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের হওয়ায় তা ব্যাপক হতে পেরেছে।

জলতিমির অস্তিত্বহীনতার ঝিরূপ

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য উপন্যাস 'জলতিমির'। উপন্যাসটির অনবদ্যতা বিধৃত আছে মানুষের অস্তিত্বহীনতাজনিত সঙ্কটের ঝিরূপ দানের মধ্যে। উপন্যাসটির সমস্ত শক্তি নিহিত আছে মানুষের এই অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটের ক্রম-বিবর্তনকে শিল্পরূপে সংহত করার মধ্যে। উপন্যাসের আলোচনায় প্রবেশের আগে এই সঙ্কট ও আবর্তে আটকে-পড়া মানুষের অস্তিত্বহীনতার বিবর্তনসূত্রটিকে বুঝে নেওয়া দরকার। সেখানে

জলতিমির ঞ ক. প্রথমত রামপ্রসাদ নামের একজন ব্যক্তির সঙ্কট। এই সঙ্কট এসেছে পানীয় জলে মিশে থাকা আর্সেনিক বিষের কারণে। আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

খ. দ্বিতীয় স্তরে এই সঙ্কট ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে অন্নপূর্ণা, মালতী, শ্যামা প্রমুখের দেহে সংক্রামিত হয়ে পড়ার সঙ্কটে পরিণত হয়েছে--- সর্দার পাড়ার সঙ্কট তা।

গ. তৃতীয় স্তরে পাড়ার এই সঙ্কট একটা বিশেষ অঞ্চলের সঙ্কটে বিবর্তিত। কেননা, সর্দার পাড়ার অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট খ্যাদা বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গড়িয়েছে। সেখানকার চৌধুরি বাড়ির মানুষ-জনেরাও বিপন্ন অস্তিত্বে দিন যাপন করছে।

ঘ. চতুর্থ স্তরে ঔপন্যাসিক বিশেষ অঞ্চলের এই সমস্যা-সঙ্কটকে আরও বিস্তারিত করলেন। সেখানে, আর্সেনিক-আক্রান্ত মানুষকে নিয়ে, তাদের জন্য পোঁতা গভীর নলকুপকে নিয়ে, আর্সেনিক দূষিত জলকে শুদ্ধ করার যন্ত্রকে নিয়ে, একটি রাজনৈতিক ডামাডোলের প্রেক্ষিত রচনা করলেন ঔপন্যাসিক। বিজ্ঞান মঞ্চের সচেতনতার প্রচার এই রাজনৈতিক কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। এই স্তরে মানুষের সামাজিক জীবনটা সঙ্কটে-অস্তিত্বহীনতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ঙ. পঞ্চম স্তরে মানুষের এই অস্তিত্বহীনতার সঙ্কট তখনই দেশ ও জাতির সঙ্কটরূপে বিবর্তিত হয় যখন দেখি মানুষের এই অস্তিত্বহীনতার আবর্তের মধ্যে এম. এল. এ., মন্ত্রী, দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছে।

চ. ষষ্ঠ স্তরে দেশ ও জাতির এই সঙ্কট ঝিগত হয়ে উঠেছে বিদেশী সাহেব, তৃতীয় বিশ্বের অপুষ্টি, পেটেন্ট সমস্যা এবং সর্বোপরি পৌরাণিক মিথের মধ্যে চিরকালীন শোষক-শোষিতের সম্পর্কের আবিষ্কারে ও তার ঔপন্যাসিক প্রয়োগের মাধ্যমে। --এইখানেই উপন্যাসের সত্য সন্দর্ভটি রচিত।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখার, তা হল যে সরল সমীকরণে মানুষের অস্তিত্বহীনতার সঙ্কটের ঝিরূপদানের বিবর্তনের কথা বলা হল, উপন্যাসে তা অতটা সহজ সরলতায় চিত্রিত হয়নি। বরং উপন্যাসটির বিষয় বিন্যাস ও বক্তব্য-পরিবেশনা বেশ জটিল। 'স্বপ্নের সোনা ও যমুনার বাঁশি', 'কালীয়া দমন, সময়ের পুরাকীর্তি এবং গ্রাম্য গোধিকার', 'কংগ্রেস কল, সি. পি. এম. কল বা একটি অলৌকিক গাধা', 'পাইরাইটের রাজনীতি', 'মৃত্যুর তদন্ত বা স্বপ্নের তড়কা', 'ক্ষুধার বাণিজ্য', 'যাত্রার পটভূমি' শীর্ষক আটটি অধ্যায়ে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু শিল্পকায়া লাভ করেছে। একটি আঞ্চলিক সমস্যা--- এতবিধ উপশিরোনামের পরতে পরতে গ্রন্থি পেতে পেতে ঝিগত সমস্যায় জারিত হয়েছে। মূলত সমাজ-সঙ্কটের ঝিরূপ নির্মাণেই এই উপন্যাসের ও তারস্রষ্টার যথার্থ সিদ্ধি।

অর্থাৎ 'পক্ষ-বিপক্ষ' উপন্যাসে সামাজিক অবক্ষয় ও সঙ্কটের ঘূর্ণিচক্রের যে প্রতিষ্ঠা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন, 'জলতিমির' যেন তার পরবর্তী ধাপ, এখানে সামাজিক সঙ্কটের ঝিরূপে প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার পিছনে লেখক জুড়ে দিয়েছেন পৌরাণিক

কালীয়-দমন শীর্ষক উপাখ্যানটিকে। ব্যাপারটি এইরকম

জলতিমির পঞ্চ ১. আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের জীবনের সঙ্কট-- এরই সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক নানান সুবিধাবাদ ও সঙ্কট সমাজ-মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

২. এই বিপন্ন অস্তিত্ব বিগত হয়েছে গড়-কালীয় পৌরাণিক মিথের মধ্যে চিরকালীন শোষক শোষিতের সম্পর্ক আবিষ্কারে। এখানে শোষিত কালীয় শোষক গড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য সৌভরি মুনির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু সেই কালীয়ই পরবর্তীতে শোষক হয়েছে, অত্যাচারী হয়েছে। এবং তাকে দমন করেছে কৃষ্ণ। এই ব্যাপারটি লেখকের বর্ণনায়

ক. 'ধর্মাবতার, হয়তো নিরীহ মানুষকে বাঁচানোর দুর্জয় প্রয়াসই যে কোনও বিপদকে তুচ্ছ মনে করতে পারে। নইলে কোথায় বালক কৃষ্ণ আর বিপুল শক্তিধর নাগ কালীয়। এই পরম্পরার জন্যই বোধ হয় ছোট্ট ভিয়েতনাম বা একফোঁটা কিউবা একটি শক্তিধর যুদ্ধাগারের কালীয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মেকং বা ক্যারিবিয়ান উপসাগরের কালিদহে নেমে পড়েছিল।'

এরই সাথে সারা বিশ্বের পেটেন্ট সমস্যা ও তার অধিকারের ব্যাপারটিকে যুক্ত করে দিয়ে ঔপন্যাসিক বি-সঙ্কটকেই আরও মূর্ত করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের চবিবশ পরগনা জেলার কোনও এক সর্দার পাড়ার অন্নপূর্ণা ও পরাণ, একদিন এককণা সোনা কুড়িয়ে পেয়ে, দেহে-মনে কোনও এক স্বপ্নরাজ্যের অধিবাসী হতে চেয়েছিল-- কিন্তু সেই স্বপ্ন সঙ্কটাপন্ন হল বিশ্বময় আগ্রাসী পণ্যায়নের ও শোষণের পটভূমিতে। ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এইখানেই বড় মাপে অঙ্কিত হয়ে যায়।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের বিষয়-বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি, তিনি চলমান জীবন ও সময়কে শিল্পের বাস্তবতায় প্রতিফলিত করান অনায়াস দক্ষতায়। তাঁর নির্মাণে খুব বেশি পরিমাণে প্রকট হয়েছে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষের তীক্ষ্ম সংগ্রাম মুখরতা। এই সংগ্রামে যদিও ব্যক্তিমানুষ বারে বারে প্রতিকূল অবস্থার ঘূর্ণিপ্রবাহে পড়ে ধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। এই ধ্বস্ত-বিক্ষত মানুষের অন্তর্জ্বালারই তীক্ষ্ম রূপায়ণে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমাদের প্রাণের সম্পদ হতে পেরেছে। তবে এখানে একটি বিদ্ধ ভাবনার অবকাশ থেকেই যায়-- সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণার তীক্ষ্মতা প্রকাশ পেলেও, বিস্তার পায়নি তা। ব্যক্তিযন্ত্রণার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে ধ্বস্ত সময় ও মানুষের যন্ত্রণার মহাকাব্যিক বিস্তারের যে সম্ভাবনা তাঁর উপন্যাসগুলিতে রয়েছে, তার সদ্ব্যবহার ঔপন্যাসিক করেন নি। করেননি বলেই, কালের যে মহাট্র্যাজেডির সূত্রপাত তাঁর উপন্যাসে আছে-- তা পরিপূর্ণ হতে পারেনি। মনে হয় উপন্যাসের ঘটনা-কাহিনী ও বিশ্লেষণ আরও বিস্তার লাভ করলে সেই মহা ট্র্যাজেডির তীক্ষ্মতা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম না। আর একটা কথা, তাঁর উপন্যাসে পুষ চরিত্রগুলির যে খনন, যে অন্তর্দহন আমাদেরকে চুম্বক শক্তিতে টেনে রাখে, নারী চরিত্রগুলিতে সেই দহন-খনন নেই যেন। পুষ চরিত্রগুলোর পাশে তারা যেন অনেকখানিই একরঙা (এখানে 'পক্ষ বিপক্ষ'এর দুলালী চরিত্রকে ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়) আঁচড়ে ফুটে ওঠা মানুষ। কিন্তু এটা বাহ্য। কাহিনী নির্বাচনে ও বিষয়ভাবনায় তিনি যে বিকল্প পথের পথিক, স্বতন্ত্র শক্তিকেন্দ্রের ধারক রূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন-- তাই-ই বর্তমান কালের বাংলা উপন্যাসের বড় প্রাপ্তি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com